ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার তাণ্ডব এখন পশ্চিমবঙ্গেও

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

ধরিত্রীকে মাতা বললেও তিনি আবার বিষকুম্ভও বটে। ধরিত্রী তার বুকের ভিতর ধারণ করে থাকে অনেক বিষও। ভালো করে না বুঝে শুনে ভূগর্ভজল আহরণে সৃষ্ট এক আর্সেনিক সমস্যাতেই পশ্চিমবঙ্গ জেরবার, তাতে এখন আবার জানা যাচ্ছে ভূগর্ভজল বাহিত হয়ে উঠে আসছে আর একটি ভয়ঙ্কর অজৈব রাসায়নিক বিষ, যা মানুষ ও জীবদেহে, বিশেষ করে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে, প্রবেশ করে বিস্তর অসুখ-বিসুখ, ব্যথা - বেদনার পঙ্গুত্ব-মৃত্যুর কারণ হয়। জলে ফ্লোরাইড থাকলে বাইরে থেকে, রাসায়নিক পরীক্ষা না করে, বোঝাই সম্ভব নয় যে তাতে ফ্লোরাইড বিষ আছে। কারণ ফ্লোরাইডের না আছে বর্ণ, না স্বাদ-গন্ধ। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এটা ইউরোপ-আমেরিকায় জানা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষা করে এসেছে। ফ্লোরাইড সমস্যা উন্নত দেশ সমূহে নিয়ন্ত্রিত হলেও, আমাদের মত অনুন্নত দেশ সমূহে তা ব্যাপক এবং প্রকট। চিন, ভারত, পাকিস্তান, মোঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, লিবিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের সমস্যা এখনো বিরাট। পশ্চিমবঙ্গেও যে ফ্লোরাইড বিষণ সমস্যা যথেষ্ট তাও এখন জানা যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মালদার কিয়দংশ, দুই দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগণার বহু নলকুপের জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা বিপদজনক সীমার উপরে। এসব বিষয়ে সামান্য যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা ভারত সরকার সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের চাপে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (PHED) কিছু কাজ করেছেন। তবে সেখান থেকে বিধিমত আবেদন করেও, ও বার বার গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি এখন পর্য্যন্ত। তবে তাঁদেরই আহরিত তথ্য ভিন্ন সূত্রে হাতে এসেছে এবং তা দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি। শুনেছি এ ব্যাপারে (অর্থাৎ ফ্লোরোসিস মোকাবিলায়) 'কি করা যায়'? নিয়ে রাজ্যসরকার উচ্চপর্য্যায়ের একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে আহূত একজন ভিনরাজ্যের ফ্লোরাইড বিশেষজ্ঞ এখানকার কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও জ্ঞানের বহর দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। এখন এ আলোচনায় আরো অগ্রসর হওয়ার আগে ফ্লোরাইড ও ফ্লোরাইড ঘটিত অসুখ-বিসুখের প্রাথমিক একটা পরিচিতি সেরে নেওয়া প্রয়োজন।

ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখেছি মানুষজনদের, বাচ্চাদের বিশেষ করে দাঁতে হলদে, বাদামী, কালো ছোপ। আর ঘরে ঘরে মানুষের যন্ত্রণার কাতরানি। কেউ লাঠি ভর দিয়ে চলেন কেউ বা কুঁজো হয়ে। কেউ আবার বহু বছর শয্যাশায়ী।

ফ্লোরাইড পরিচিতি :

ফ্লোরিন হ্যালোজেন পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য, যা রাসায়নিক ভাবে সর্বাধিক সক্রিয় এবং মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে না, পাওয়াও যায় না। বহুদিন পর্য্যন্ত ফ্লোরিন মৌল (F2) প্রস্তুতি ছিল রসায়নবিজ্ঞানের একটি দুরুহতম অসমাধিত সমস্যা, যার সমাধান করে (1886) ফ্রান্সের আঁরি ময়সা নোবেল পুরস্কার পান পরে। আমাদের ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত ফ্লোরিনের রসায়ন ও রসায়নশিল্প বিশেষ এগোয়নি। অল্প যা ছিল তা সহজ, পড়তে বা পড়াতে বিশেষ অসুবিধে হত না। এখন দিন বদলেছে। ফ্লোরিন গ্যাস উৎপাদন এখন সহজতর হয়েছে। তার উৎপাদন ও বিপণনে এখন ব্যাপকতা এসেছে। ফ্লোরিন থেকে উৎপাদিত হচ্ছে বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বেশীর ভাগই জৈবযৌগ, যাদের উৎপাদন ও বাজারজাত করে বহু বহুজাতিক সংস্থা প্রচুর মুনাফা করছে। কিছু দৃষ্টান্ত:

ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFCs); টেফ্লন ও ফ্লোরিন ঘটিত নানারকম প্লাষ্টিক; রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র নার্ভগ্যাস; ফ্লোরিন ঘটিত ওষুধপত্র, যার মধ্যে আছে কিছু অ্যানিসথেটিক রাসায়নিক, ক্যান্সারের কিছু ওষুধ, ফ্লোরিন ঘটিত কিছু

অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি।

রাসায়নিক ভাবে ফ্লোরিন সক্রিয়তম মৌল। তাই মুক্ত অবস্থায় সে থাকতেই পারে না। থাকে ফ্লোরাইড আয়ন হিসাবে, যাকে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের বিয়োজনে উৎপন্ন ধরা যায়। প্রকৃতিতে কয়েকটি আকরিকে থাকে। যথা : ফ্লোরস্পার, অ্যাপাটাইট, ক্রায়োলাইট ইত্যাদি। আর থাকে গ্র্যানাইট, ব্যাসাল্ট ইত্যাদি শিলায়। রেল লাইন ও রাস্তায় যে কালচে পাথর দেখা যায় তা ব্যাসাল্ট। বীরভূম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে এসব অনেক আছে। ফ্লোরাইড ঘটিত আকরিক বা শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলে ফ্লোরাইড ঢুকে পড়ে এবং তার মাধ্যমে জীবদেহে অনুপ্রবেশ ঘটে। জলের একটা প্রধান ধর্ম হ'ল যে এটি একটি প্রায় সার্বজনীন দ্রাবক, যা কম বেশী সবকিছুই, এমনকি গ্র্যানাইটও, কিছুটা দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। কোন অঞ্চলের ভূরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে সেখানকার ভূগর্ভজলে ফ্লোরাইড আসবে কিনা।

জীবদেহে ফ্লোরাইডের অপক্রিয়া :

জীবদেহে প্রবেশ করতে পারলে ফ্লোরাইড তার কয়েকটি অসাধারণ রাসায়নিক বৈশিষ্টের জন্য জীবদেহের সূক্ষ্ম জটিল বিরাট রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে প্রচুর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তাতে নানারকম অসুখ-বিসুখ সৃষ্টি হয়। বিস্তর ব্যথা-বেদনারও কারণ হয়। এইসব রোগকে ফ্লোরোসিস্ বা আরো সঠিকভাবে ফ্লোরাইড টক্সিকোসিস বলে। যেহেতু আমাদের দেশের চিকিৎসা শিক্ষার বইপত্র ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত, তাদের দেশের প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত, তাই ফ্লোরোসিস, আর্সেনিকোসিস, সর্পদংশন প্রভৃতি বিষয় ঐসব পুস্তকে প্রায় কিছুই থাকে না। অনুরূপে আমাদের কেমিস্ট্রি পঠন-পাঠনে জীবদেহে ফ্লোরাইডের ক্রিয়া বিষয়ে কিছু থাকে না। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আসা আমারও একই হাল। অর্ধশতাব্দীর রসায়নচর্চা গবেষণা সত্ত্বেও জীবদেহে ফ্লোরিনের অপক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। 2006 সালে বীরভূমের ফ্লোরাইড অধ্যুষিত নসীপুর গ্রামে গিয়ে, ফ্লোরোসিস আক্রান্ত মানুষজনদের করুণ অবস্থা দেখে এক ধাক্কায় চৈতন্যোদয় হ'ল। এ বিষয়ে পরে আবার আসবো। এটা প্রায়শ হচ্ছে যে, না জানার ফলেই ফ্লোরোসিস আক্রান্ত রোগীদের বহু ভুল চিকিৎসাই হয়ে চলেছে। যে রোগীকে ফ্লোরাইড মুক্ত পরিবেশে রাখতে পারলে, ফ্লোরাইডমুক্ত জল, খাবার দাবারের সুব্যবস্থা করতে পারলে আরোগ্য হত, তার বদলে তাদের স্ক্লেরোসিস্, স্পনডাইলোসিস, আরথ্রাইটিস, অষ্টিয়োপোরোসিস, রিকেট প্রভৃতি ভেবে দীর্ঘদিন ভুল চিকিৎসাই করা হয়।

মানবদেহে ফ্লোরাইডের বিষক্রিয়া আর্সেনিকের থেকে সামান্য কম, কিন্তু লেডের থেকে বেশী। তিনটি বিশেষ রাসায়নিক ধর্মের জন্যই জীবদেহে ফ্লোরাইড এত অনর্থ ঘটাতে পারে।

1. ফ্লোরাইড (F^-) ও হাইড্রক্সাইড মূলক (OH^-) এর ইলেকট্রনিক সজ্জা একইরকম এবং তাদের আকারও কাছাকাছি হবার জন্য হাড় ও দাঁতের ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সি ফসফেটে $[Ca10(PO4)6 (OH)2]$ আয়ন বিনিময় করে সহজে কৃষ্ট্যাল ল্যাটিসে ঢুকে পড়েও জমতে থাকে। উৎপন্ন ফ্লোরো ফসফেটের ঘনত্ব ও ল্যাটিসের সামান্য পরিবর্তন হয়। ফলে হাড়গুলি হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। অল্প আঘাতেই হাত পা ভাঙ্গে। ফ্লোরাইডের জন্য 'হিপ-ফ্র্যাকচারও' বেশি হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল শিরদাঁড়ার ফ্লোরোসিস বা 'স্কেলিটাল ফ্লোরোসিস'। এর ফলে মানুষ একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাহিত্যে যাকে বলে 'ক্রিপলিং ফ্লোরোসিস'। জল, বাতাস, খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে যত ফ্লোরাইড শরীরে ঢোকে তার কিছু ঘাম, মলমূত্রাদি মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। অবশিষ্ট ফ্লোরাইডের নিরানব্বই শতাংশই হাড়ে ও দাঁতে জমে।

হাড় হল মস্তবড় কোলাজেন প্রোটিন টিসু বা কলা। তার ধাত্র (matrix) মধ্যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সি ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট কেলাস সমূহ নিষিক্ত (impregnated) থাকে। হাড়ের হয় ক্রমাগত ক্ষয়, গঠন, পুর্নগঠন। ফ্লোরাইডের দীর্ঘদিন ক্রনিক অনুপ্রবেশে হাড়ের গঠনে অস্বাভাবিকত্ব আসে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি, টেণ্ডন, 'ক্যানসেলাস বোন' সমূহ। তাদের গঠনে বিকৃতি এলে অস্থিসন্ধি সমূহের কমনীয়তা কমে, আড়ষ্টতা বাড়ে। তাই হাত, ঘাড়, পিঠে ব্যথা হয়, নড়াচড়াতেও কষ্ট হয়। কখনও তারা স্থায়ী ভাবে বেঁকে যায়। ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে

রাজস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ

মানুষজন, গবাদিপশু ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এইসব অনেক দেখা যায়।

ক্রনিক বিষণ বা দীর্ঘদিন শরীরে অল্পমাত্রায় ফ্লোরাইডের অনুপ্রবেশের বহির্লক্ষণ প্রধানত দুটি:

একটি, পঙ্গুকারী ফ্লোরোসিস (**crippling fluorosis**)। অপরটি দাঁতের চিত্রবিচিত্রতা (**mottled enamel**) । ফ্লোরাইড অধ্যুষিত অঞ্চলে দেখেছি মানুষজনদের, বাচ্চাদের বিশেষ করে দাঁতে হলদে, বাদামী, কালো ছোপ। আর ঘরে ঘরে মানুষের যন্ত্রণার কাতরানি। কেউ লাঠি ভর দিয়ে চলেন কেউ বা কুঁজো হয়ে। কেউ আবার বহু বছর শয্যাশায়ী। এপাশ ওপাশ করতেও অপরের সাহায্য ছাড়া হয় না। অকাল বার্ধক্য সর্বত্র প্রকট। ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রীয়, বিপাকীয় ক্রিয়া কর্ম। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে মানুষে মানুষে সব সময়ই পার্থক্য থাকে, একই মাত্রার বিষে প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্য দেখা যায়। আবার ফ্লোরাইডে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মানও নির্ধারণ করে তার সহনশীলতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা। অতএব এটা পরিষ্কার যে যে সব অঞ্চলের মানুষজন দরিদ্র, তাদের পুষ্টিমান নিম্ন এবং ফ্লোরাইড মুক্ত পানীয় জল রান্নার জল পায় না, তাদের জীবনভর বর্ধিত যন্ত্রণা থাকবেই।

এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য কিছু ধাতু নিষ্কাশন ও ফসফেট সার উৎপাদন কারখানার আশপাশের জল ও বাতাসে ফ্লোরাইড দূষণ ছড়ায়। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত বহু দেশে এইসব দূষণ অনেকটাই আজ নিয়ন্ত্রিত।

2. জীবদেহে ফ্লোরাইডের প্রকট অপক্রিয়ার আর একটি কারণ হ'ল ফ্লোরাইডের জোরালো হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তি। আগেই বলেছি হাড় হল একটি প্রোটিন টিসু। ফ্লোরাইড তার হাইড্রোজেন বন্ধন শক্তির দ্বারা প্রোটিনের জটিল আনবিক গঠনে বিকৃতি আনে। তাদের কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হয়, হাড়ের বিকৃতি ঘটায়। দাঁত ওঠার সময় অ্যামেলোজেনিন (**amelogenin**) প্রোটিনের সংশ্লেষণ বিঘ্নিত করে দাঁতে বিকৃতি আনে, 'মটলিংও' হয়। ফ্লোরাইড ডি এন এ'র হাইড্রোজেন বন্ধনীগুলিকেও ভাঙ্গতে পারে, এবং তাদের মেরামতিতেও বিঘ্ন ঘটায়। জিনের পরিবর্তনও ঘটায়।

3. ফ্লোরাইডের আবার আছে জটিল যৌগ তৈরী করবার বিশেষ প্রবণতা ও ক্ষমতা। ফ্লোরাইড ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন প্রভৃতির সাথে শক্ত রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে তাদের কার্যকারিতা ক্ষুন্নকরে। ফলে বহু এনজাইম তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম করতে পারে না। ফলে নানাবিধ অসুখ বিসুখ স্বাভাবিক।

ফ্লোরাইড ও অ্যালঝাইমার :

লণ্ডনের কিংস কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর জন এমসলে একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তাত্ত্বিক গণনা থেকে তিনি দেখিয়েছেন (1981) ফ্লোরাইড ডি এন এ'র হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙ্গতে পারে। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মানুষ ও পরিবেশ নিয়ে অনেক

বইলিখেছেন। একটি বইতে তিনি দেখিয়েছেন যে এলুমিনিয়াম অ্যালঝাইমারের কারক, যা অনেক বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা ভিত্তিহীন। তিনি বলছেন এইরকম অপপ্রচার এলুমিনিয়ামের মত প্রয়োজনীয় উপকারী একটি শিল্পের বিরুদ্ধে অসঙ্গত অপপ্রচার। মাস কয়েক আগে আমি তাঁকে লিখলাম এলুমিনিয়াম আয়নের সাথে ফ্লোরাইড ও দেহস্থ হাইড্রক্সিল মূলক মিলে যে জটিল যৌগাদি উৎপন্ন করে [যথা : AlFx, বিশেষ করে AlF3(OH)–] তারা ফসফেট অনুকারী (phosphato mimic) এবং সেগুলি রক্ত বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে কতকগুলি প্রোটিন ও এনজাইমের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে সঙ্কেত প্রেরণে বিঘ্ন ঘটায়, যা অ্যালজাইমারের অন্যতম কারণ, এটাতো অনেক বিজ্ঞানী দেখাচ্ছেন। আমার বক্তব্যের ভিত্তি জানতে চাইলে আমি তাঁক নিচের দুটি নির্দেশিকা পাঠাই:

i. Christopher Bryson : the fluoride deception, 2004 (pp 226)
ii. National Research Council (USA) : Flouoride in Drinking Water : A Scientific Review of EPA's Standards, 2006 (pp 219-20)। সাহেব আমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে ওগুলো দেখবেন লিখেছেন। তাঁর থেকে একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ সংবাদ পেলাম। তা হ'ল 1987 সাল থেকে কিংস কলেজে কেমিষ্ট্রি উঠে গেছে। ওদেশের ছেলেমেয়েরা কেমিষ্ট্রির মত বিষয়কেও অপছন্দ করছেন, না রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্যাদির মানুষ ও পরিবেশের উপর কুফল দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেমিষ্ট্রিই পরিত্যাগ করছে? নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জনপ্রিয়তাও আজ কমে গেছে। কিন্তু কেমিষ্ট্রির আশীর্বাদের দিকটাও তো উপেক্ষণীয় নয়। সমগ্র রসায়ন শিল্পই তো আর ভূপাল, 'ডার্টি ডজন', ডাইঅক্সিন, পিসিবি, সি.এফ.সি, থ্যালিডোমাইড নয়। সব জায়গাই আই.টি দিয়ে ভরে দিলে চলবে?

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে মনে হয় অ্যালঝাইমার থেকে সাবধানতা অবলম্বনের একটা উপায় হ'ল এলুমিনিয়ামের পাত্রে রান্নাবান্না না করা বা ঐ ধাতুপাত্রে না খাওয়া, বিশেষ করে সেখানকার জলে যদি সামান্যতমও (20-200 পিপিবি) ফ্লোরাইড থাকে।

মুস্কিল হচ্ছে জীবানু, এমনকি আর্সেনিক সনাক্তকরণও আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগে তো ফ্লোরাইড সনাক্তকরণ ও পরিমাপ করা রসায়ন বিজ্ঞানে সহজসাধ্য ছিল না। তবে এখন দিন বদলেছে। আয়ন সিলেকটিভ ফ্লোরাইড ইলেকট্রোড আবিষ্কৃত হওয়ায় ফ্লোরাইড পরিমাপ সহজ হয়ে গেছে।

ফ্লোরাইডের ইতিবৃত্ত :

এখন জানা গেছে ভারতের অন্ততঃ 17টি প্রদেশে ফ্লোরাইডের সীমিতমারী (endemic)। সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হল : রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র, কর্ণাটক। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, কেরালায় যথেষ্ট ফ্লোরাইড দূষণ দেখা যায়। এখন ভারতের ফ্লোরাইড মানচিত্রে যুক্ত হচ্ছে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গও। ভারত সরকারের 2004 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে এখন ফ্লোরোসিসে ভুগছেন অন্ততঃ সাত-আট কোটি মানুষ। 1970 সালের আগের এক তথ্য থেকে দেখছি (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা) পাঞ্জাবে ফ্লোরোসিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ। এরা সবাই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, দুর্বল শ্রেণীর মানুষজন। তাঁদের আর্থিক বা রাজনৈতিক শক্তি কিছুই নাই। তাই তাঁরা দীর্ঘদিন অসহায়ভাবে রোগভোগ, যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে মৃত্যুর পর মুক্তি পান।

ভারতে ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার আবিষ্কার 1930 এর দশকের প্রথমদিকে। আবিষ্কারক হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী নালগোণ্ডার চাষীরা, অবশ্যই না জেনে, অনেকটা যেন বসন্তের টীকা আবিষ্কারের এডওয়ার্ড জেনারের গয়লানিদের মতন। চাষীরা দেখতেন বলদ চাষ করতে করতে আর টানতে পারছে না, মাঠে শুয়ে পড়ছে। আর উঠতে পারছে না। নতুন গরু এনে চাষ করতে গেলেও তাদেরও পরে হত একই হাল। ক্রমে আঞ্চলিক মানুষজনদের ভিতরও অনুরূপ ব্যাপার দেখা যেতে আরম্ভ করল। এইসব ঘটনার কথা সাহেব ভেটেরেনারি ডাক্তার সর্টের কানে গেল। তিনি তাঁর ভারতীয় সহকর্মীদের নিয়ে এই অজানা রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে ফ্লোরাইড বিষক্রিয়া

আবিস্কার করলেন। নালগোণ্ডা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক, ভূরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাদির জন্য সেখানকার ভূতল জল, উদ্ভিদ ঘাস মাটিতে অত্যধিক ফ্লোরাইড আসে। মানুষ ও গবাদি পশুদের ভিতর ফ্লোরোসিসের কারণ ঐসব ফ্লোরাইড। ভারত থেকে প্রকাশিত ফ্লোরাইডের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সেই 1937 সালে, সর্ট ও সহকর্মীদের দ্বারা। ভারতে তারপর ফ্লোরোসিস নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, হচ্ছেও। কিন্তু আক্রান্ত মানুষজনদের সুরক্ষা ও চিকিৎসা খুব এগোয়নি, যদিও আমাদের দেশ চাঁদে মানুষ পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। নালগোণ্ডায় অনেকদিন থেকেই জল থেকে ফ্লোরাইড দূর করে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যাল স্কেলে হচ্ছে। তাতে রাসায়নিক তঞ্চণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী বিখ্যাত এই প্রযুক্তিকে নালগোণ্ডা টেকনোলজি বলে।

নসীপুরে একদিন :

বীরভূমের নলহাটী ষ্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে গেলে নসীপুর, ভবানন্দপুর, গ্রামগুলি ফ্লোরোসিসের সীমিতমারী অঞ্চল। সত্তরের দশকের শেষদিকে জীবানুমুক্ত নিরাপদ জলসরবরাহের জন্য সরকার থেকে এখানে নলকুপ বসানোর পর থেকেই এইসব অঞ্চলে ফ্লোরোসিসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঠিক আর্সেনিকের মত। কয়েক বছরের মধ্যেই ফ্লোরাইডের মারণতাণ্ডব দেখা যায়। আগে লোকে ঝর্ণা, নদী, পুকুর, 'সী-পেজ' থেকে জল ব্যবহার করত। তাতে জীবানুঘটিত রোগভোগ কখনো হলেও ফ্লোরোসিস ছিল না। নসীপুর গ্রামের নাম পদবীতে বয়ে গেলেন আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক ধনঞ্জয় নসীপুরী, বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ, যিনি আমাদের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে খড়গপুর আই.আইটিতে ছিলেন। এখন ঐসব অঞ্চল থেকে ধনঞ্জয় বাবুর মত বিদ্বান বুদ্ধিমান আর কেউ হবেন না। যাঁরাই পেরেছেন তাঁরাই ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে সহরে গিয়ে বাস করছেন। তাছাড়া জলের ফ্লোরাইড যে আর্সেনিকের মতন শিশুদের মেধা বিনষ্টির কারণ তা সাম্প্রতিক বিজ্ঞান গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্লোরাইড স্নায়ুতন্ত্র বিষক (neurotoxic) এবং এলুমিনিয়ামের উপস্থিতিতে অ্যালঝাইমার রোগের কারণ।

শিল্প বর্জ্য নিষ্পত্তির অপূর্ব আমেরিকান উদ্ভাবন

লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই জোর করেই সংযত হতে হচ্ছে। তবে একটা ধাঁধার উত্তর না দিলে বিওবি'র পাঠকরা ছাড়বেন না। ধাঁধাটি হ'ল এই :

ফ্লোরাইড যদি এতই খারাপ তবে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মত দেশে কেন জলের ফ্লোরিডেশান করা হয়? অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবে বাইরে থেকে ফ্লোরাইড যোগ করা হয়? ই.পি.এ'র সুপারিশ হ'ল লিটারপ্রতি জলে 4 মিগ্রা পর্য্যন্ত। বিশ্বসংস্থার আশ্চর্য্য সুপারিশ হ'ল লিটারপ্রতি 1.5 মিগ্রা। ভারত সরকারের 1.0 মিগ্রা। টুথপেস্টেও কেন ফ্লোরাইড যোগ করা হয়? দন্ত চিকিৎসাতেও ফ্লোরাইডের ব্যবহার প্রচলিত।

কলগেট টুথপেষ্টে দেওয়া হয় সোডিয়াম মনোফ্লোরো ফসফেট। আর প্রোক্টর অ্যাণ্ড গ্যাম্বল কোম্পানীর ক্রেষ্ট টুথপেষ্টে দেওয়া হয় স্ট্যানাস ফ্লোরাইড। ফ্লোরাইড নাকি দাঁতের সুরক্ষা করে, এমনিই বিজ্ঞাপন। আমেরিকার পানীয় জলে দেওয়া হয় ফ্লোরোসিলিকেট। আমেরিকায় সরকার আবার দাবী করেন, সদম্ভে ঘোষণা করেন যে সংক্রামক রোগনিবারণের জন্য ভ্যাকসিন বা টীকার ব্যবস্থা করা ও ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর প্রযুক্তির সাথে জলের ফ্লোরিডেশন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর 10 টি বৃহত্তম জনস্বাস্থ্য রক্ষার কীর্তি সমূহের অন্যতম। এ বিষয়ে যথাযোগ্য উত্তর বা ব্যাখ্যা নিচের কয়েক লাইনেই সেরে প্রবন্ধের সমাপ্তি টানছি।

আমেরিকায় কতকগুলি কর্পোরেট সেক্টরের আছে বিশাল বিশাল রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা তাদের বিরাট মুনাফার উৎস, আর আমেরিকার অর্থনীতি রাজনীতির ভিত্তির অনেকটাই।

সেই তিনটি শিল্প হ'ল : ফসফেট সার, এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন (এয়ারক্র্যাফট শিল্পের জন্য যা অত্যাবশ্যক); আর পরমানু জ্বালানি ইউরেনিয়াম - 235 প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড উৎপাদন।

এই তিনটি শিল্প থেকেই বিপুল পরিমানে ফ্লোরাইড বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার সুষ্ঠ নিষ্পত্তির আজো কোনো সন্তোষজনক সমাধান

নাই। ফ্লোরাইড যেহেতু একটি মৌলিক পদার্থ, যার সৃষ্টি নাই, বিনাশ নাই, তার নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। নদীতে, সমুদ্রে, লেকে, ভূগর্ভে এত ফ্লোরাইড ফেললে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা বিষম সোরগোল বাধায়। তাই তাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তিকেই নষ্ট করে দেবার জন্য অপবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে পানীয় জলে শিল্পজাত ফ্লোরাইড নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হল। জলে ফ্লোরাইড, টুথপেষ্টেও ফ্লোরাইড দিয়ে মানুষের ফ্লোরাইড ভীতি কমিয়ে তাকে গ্রহণীয় করে তোলার ব্যবস্থা হ'ল। ফ্লোরাইড বর্জ্য আর পরিবেশে না ছড়িয়ে অল্প অল্প করে মানুষ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহে সঞ্চয় করে কবরস্থ করার চমৎকার স্থায়ী ব্যবস্থা হ'ল। বর্জ্য নিষ্পত্তির অপূর্ব আমেরিকান উদভাবন। লক্ষণীয় ফ্লোরিডেশান শুরুর কাল : 1945 সাল, অ্যাটম বোমা ফাটানোর ঠিক পরেই।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি চিনে এসব নিষিদ্ধ, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্সেও চলে না। অন্যান্য কিছু দেশে জল ও টুথপেস্টে ফ্লোরাইড যোগ করার শুরু ও বন্ধ করার কাল দেখানো হ'ল।

দেশের নামের পাশে শুরু ও বন্ধের বৎসর দেখানো হ'ল।

জাপান	:	1952-72
নেদারল্যাণ্ড	:	1953-76
জার্মানি	:	1952-71
চেক প্রজাতন্ত্র	:	1958-88
সুইডেন	:	1952-71
ফিনল্যাণ্ড	:	1959-63

আমেরিকায় এখন যে পরিমান ফ্লোরাইড বিরোধী বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, শক্তিশালী জনমতও তৈরি হয়েছে, সেখানে আর বেশিদিন ফ্লোরিডেশান চালানো যাবে মনে হয় না। তাহলে আমেরিকার এয়ারক্র্যাফট শিল্প, পরমানু শিল্প, টেফ্লন, নার্ভ গ্যাস, পেষ্টিসাইড ইত্যাদি শিল্পের কি হবে? থাকবে কি আমেরিকার 'সুপার পাওয়ার' মর্য্যাদা?